মায়ের কাছে যাচ্ছি

রশীদ করীম

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

পারী পায়কার নাবিলা মুরশেদ ও
খোন্দকার মুশাহেদ মহিউদ্দীন-কে

এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক তথ্যগুলি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি সংলগ্ন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছি।

উপন্যাসটিকে জীবনসদৃশতা দানের জন্য স্থানে স্থানে কয়েকটি প্রকৃত নাম ব্যবহার এবং বাস্তব পরিবেশকে ধরবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই চরিত্রগুলির ভূমিকা খুব গৌণ এবং উপন্যাসে তাঁদের উপস্থিতি স্বল্পস্থায়ী। বাদবাকি সব চরিত্র ও ঘটনাকেই সম্পূর্ণ কাল্পনিক মনে করতে হবে।

রশীদ করীম

বাসা নং ১৭/১, সড়ক নং ৬
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা

একটি সাত-আট বছরের ফুটফুটে মেয়েকে কামর সাহেব প্রায়ই সকালে বা বিকেলে তাদের দোতলা বাড়ির ছাতের দেয়াল টপকে কার্নিশে নেবে পড়তে দেখেন। কার্নিশটা বেশ চওড়া। সেই বাড়িরই ষোলো-সতেরো বছরের কাজের মেয়েটি মাসে অন্তত একবার সেই কার্নিশে নেবে এসে কার্নিশটা ঝাঁট দেয়। নাববার আর উঠবার সময় তার শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসে। পাড়ার ছেলে-ছোকরারা দেখে। সেই কাজের মেয়েটিই সাত-আট বছরের ফুটফুটে মেয়েকে পথ দেখিয়েছে। মেয়েটিও একসময় সকলের চোখ এড়িয়ে কার্নিশে নেবে পড়ে। আর পা টিপে টিপে হাঁটে। একটু-একটু করে তার সাহস বেড়ে গেল। সাবধানতা কমে এলো। দশজনে যে কাজটি করতে সাহস করে না, সাত-আট বছরে, সেই কাজটাই করবার একটা প্রবণতা কারো-কারো মধ্যে থাকে। কামর সাহেব বারান্দায় বসে বই পড়েন। মাঝে মাঝে চোখ তুলে মেয়েটিকে দেখেন। মেয়েটি কার্নিশে হাঁটে। বাহাদুরিটা সে বিশেষ করে কামর সাহেবকেই দেখাতে চায়। সেও মাঝে মাঝে হাঁটায় বিরতি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কামর সাহেবের দিকে তাকায়। একটুখানি হাসে। ব্যাপারটায় কামর সাহেব অস্বস্তি বোধ করেন। মেয়েটির বাবার কাছে গিয়ে সাবধান করে দেয়ার কথাটা তাঁর মনে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত উৎসাহে কুলোয় নি। তাছাড়া, বাড়িভরা লোক। তাদের চোখে কি পড়ে নি দৃশ্যটা?

আজও মেয়েটি ঐভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কামর সাহেব চোখ সরিয়ে নিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন, মেয়েটি কার্নিশেই হাঁটাচলা করছে। একটু পরই দেয়াল টপকে ছাতে উঠে সিঁড়িঘর দিয়ে নিচে নেবে গেল।

ছুটির দিন। কামর সাহেব ঘুম থেকে উঠেই চায়ের টেবিলটি পাশে রেখে, মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে চা খাচ্ছেন। আজ সকালে খুব ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। কামর সাহেবের মনের অবস্থা : আমার মনটি লয়ে আছি আপন মনে! এমন সময় কানে এলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা ভাঙা অংশ : কার কাজল সজল আঁখি পড়িল মনে–

আজকের দিনটি মেঘলা নয়; কিন্তু গানটি দিনটিকে বাদলা করে দিলো।

অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। আসলে, এই অন্যমনস্কতা কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একটা দোতলা বাড়ি। একতলাটাই শুরু হয়েছে চাতাল থেকে অন্তত চার ফুট উঁচুতে। বাইরের এই চাতালটি শান দিয়ে বাঁধানো। বাড়ির ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট খেলে। বৈঠকখানায় পৌঁছতে হবে সাদা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে সেই চার ফুট উচ্চে ওঠে, সাদা পাথরের একটা বড় বারান্দায় পৌঁছে, ইচ্ছে করলে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে, নাক বরাবর হেঁটে গিয়েই, সামনের একটি দরোজায় টোকা দিয়ে।

ক্লান্ত থাকলে কাজটা মেহন্নতের মনে হয়; কিন্তু শ্বেতপাথরের একটি গুণ আছে। ওপরের বারান্দায় উঠে এলেই শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর সিঁড়িগুলোরও একটা বড় গুণ আছে। সেগুলো উচ্চতায় আর প্রস্থে এমন চুশতভাবে মাপা, যে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, মনেই হয় না। বারান্দায় উঠেই, এবং বৈঠকখানায় পৌঁছবার আগেই, ডানদিকে একটি ঘর। কিছুদিন আগেও সেটি নায়েব-গোমস্তাদের আপিস ছিল। এখন সেরকম বড় জমিদারিও নেই। সেসব কর্মচারীও নেই; কিন্তু কিছু আশ্রিত সেখানে এখনো বাস করে।

বারান্দার বাম দিকে দোতলায় উঠবার এক্কেবারে খাঁটি সেগুন কাঠের সিঁড়ি। আগেকার সেই রমরমাই-দবদবাই, আন-বান-শান নেই, তবু বছরে একবার সিঁড়িগুলো এখনো পালিশ করা হয়। ব্যানিস্টারে হাত দিলে মনে হয় কোমল কিছু স্পর্শ করছি। সিঁড়ি একটু উঠে গিয়েই সোজা বামদিকে আবার বেঁকে গেছে। আরো কয়েক ধাপ উঠলে একটা কাঠের বারান্দা পাওয়া যাবে। সেখানে বামদিক ঘেঁসে লেখাপড়া করার জন্য খুব দামি একটি টেবিল, তার ওপর লিখবার সব মূল্যবান সরঞ্জাম, যেমন ফাউন্টেন পেন রাখবার স্ট্যান্ডে ফাউন্টেন পেন, পিন কুশনে পিন, 'কুইঙ্ক কালি, ব্লটিং পেপার, বাজারের সবচাইতে দামি লিখবার কাগজ, পেপারওয়েট। দেয়াল ঘেঁসে বইয়ের আলমারি। সবকিছু ঝকঝক করছে। রোজ ঝাড়পোঁছ করা হয়; কিন্তু এই টেবিল চেয়ার বইয়ের ব্যবহার খুব কম। – আর সোজা এগিয়ে গেলে দ্বিতলের অন্দরমহল ! একটি দৃশ্য প্রায়ই জ্বলজ্বল করে কামর সাহেবের মনে। মাসিক বাংলা পত্রিকাগুলো বাঁধানো আছে দামি চামড়া দিয়ে। প্রত্যেকটি পত্রিকার গায়ে সোনার অক্ষরে সেই পত্রিকার নাম। ইংরেজি বইগুলোও তাই। শেকসপিয়র, মিল্টন, ওয়াল্টার স্কট, ডিকেনস, টেনিসন। আরো আছে।

বাড়ির মালিক মুর্শিদাবাদের এক বিখ্যাত জমিদার পুত্র। দিনের বেলাটা তিনি ঘুমোবার কাজে লাগান। রাত্রিবেলা কী করেন খুব কম লোকই জানে। মাখন-জিনের ট্রাউজার্স, চাইনিজ সিল্কের হাফহাতা, টেনিস শার্ট, সিল্কের বিলিতি মোজা, এবং কাটবার্সন-হার্পার থেকে কেনা জুতো পরে, বায়ুমণ্ডলে সুগন্ধি ছড়িয়ে টেনিস র‍্যাকেটটা গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে, গ্যারেজ থেকে মোটর গাড়িটা বের করে, যুবকটি যখন বেরিয়ে যেতেন, তখন মনে হতো বটে, কেউ একজন গেল। গ্যারেজের

দরজা খুলে দেয়ার জন্য, আর টেনিস-কিটটা গাড়ির বুটে সযত্নে তুলে দেয়ার জন্য, দু'তিনজন খিদমতগার আগে থেকেই অপেক্ষা করছে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের হয়ে চলে গেছে। কিন্তু এখনো জায়গাটা ল্যাভেন্ডার সাবান, ল্যাভেন্ডার আফটার শেভ লোশন, আর অ্যাট কিনসনস হেয়ার অয়েলের সুগন্ধে ভুরভুর করছে। এইভাবেই এই জমিদার বংশের কলসির জল গড়াতে গড়াতে যায়। ঠোঁটে ঝুলছে 'ব্লাক অ্যান্ড ওয়াইট' সিগারেট, হাতের আঙুল সিগারেটের ধোঁয়ায় লাল, যুবকটি পথিকদের মুগ্ধ দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতো। বাঙালিদের মধ্যে অমন একটি সুপুরুষ দ্বিতীয়টি কামর সাহেব আজ পর্যন্ত দেখেন নি।

তাঁর স্ত্রীও রূপেগুণে রাজেন্দ্রাণী। কখনো দ্রুত পায়ে হাঁটেন নি। কখনো উঁচু গলায় কথা বলেন নি। তাঁর হাঁটা দেখেই তাকে রাজমহীয়সী মনে হতো। বেগম বিবি বলে ডাকে সবাই। কামর সামান্য হাসলেন। নিয়ামতখানায় ভীম নাগ ও কে সি দাসের দোকানের মিষ্টি থাকতো।

কামর সুযোগ বুঝেই টপ করে একটি রসগোল্লা তুলে মুখের মধ্যে ফেলে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল নাড়ানাড়ি করতেন না। মুখটা হপ করে ফুলে থাকতো। সেই গেরস্তালির বাইরের নিরাপত্তায় পৌঁছে তবে তিনি দাঁতের কাজটি করতেন। বেগম বিবি সবই দেখতেন। কিন্তু দেখেছেন, কিছুতেই বুঝতে দিতেন না। বরং দোতলায় কামরকে দেখলেই বলতেন, এই ছেলে, পালাচ্ছো কোথায়? একটু বসো। মিষ্টি খাও। নিজের হাতেই, মোরাদাবাদী রেকাবিতে মিষ্টি এনে দিতেন। অন্য হাতে থাকতো পাথরের গেলাসে পানি। অমন সম্ভ্রম জাগানো মহিলাও কামর আর দেখেন নি।

তবু তাঁরা সুখী ছিলেন না। দুঃখ অবশ্য একটাই। তাঁদের ছেলে হয় না। বেগম বুবুর আত্মীয়রা রাগ করে বলেন, জামাই সারারাত বাইরে-বাইরে থাকলে ঘরের বৌয়ের ছেলে হবে কী করে? স্বামীর নিন্দা শুনে বেগম বুবু কখনো হাসতেন। কখনো রাগ করতেন।

দুলাভাই সম্পর্কে কথাটা সত্য নয়। সেটা সকলেই জানেন; কিন্তু রাগের মাথায় ঠিক কথা তো আর কেউ বলে না। দুলাভাই স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। কিন্তু বিকেলের পর ফুটবল, টেনিস এবং সন্ধ্যার পর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে না পারলে, দম বন্ধ হয়ে তিনি মরেই যেতেন!

বাচ্চা হওয়া? সকলের কি আর টাইম-টেবিল রক্ষা করে বাচ্চা হয়? হতে যখন শুরু করলো, একটি, দুটি, তিনটি হলো ! শেষেরটি জন্মলাভ করেই, একেবারেই একায়েক, বিনা কারণেই মরে গেল। পৃথিবীর মুখটা খুব সম্ভব তার ভালো লাগে নি। সেদিন বেগম বুবুর সে কী কান্না। এই দূর সম্পর্কের বোনের কথা মনে পড়লে, এখনো কামর সাহেবের চোখ ভিজে আসতে চায়।

এই বাসাতেই পাঁচ-ছ' বছরের একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি দেখতে খুব কালো। গায়ে থাকতো হাতকাটা গেঞ্জি ও খাকি কাপড়ের হাফপ্যান্ট। সে ঐ বাড়িতেই কাজ করতো। কাজ করতো মানে– আশ্রিত ছিল। একদিন সে একবার কোথাও যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। এবং বেগম বুবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকছে।

'তুই ওরকম উসখুস-উসখুস করছিস কেন রে?'

ছেলেটির দেশ মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম।

সে তার আঞ্চলিক ভাষায় যে জবাবটি দিলো, শহুরে ভাষায় তর্জমা করলে তা এইরকম দাঁড়ায়, 'বেগম বিবি, খালি মনে হয়, পায়খানা হবে; কিন্তু হওয়াতে গিয়ে দেখি, হতে চায় না!'

ছেলেটি খামোকা খুব মার খেয়েছিল। কিন্তু কামর সাহেব এতো কথা ভুলে গেছেন, তবু ছেলেটির সেইদিনের সেই কথাটি ভুলতে পারেন নি। যে বয়সে যখনি মনে পড়েছে, হাসির একটি শীর্ণ রেখা তাঁর মুখে আলো ফেলেছে।

সেই ছেলেবেলায়, গার্ড নারস লেন হয়ে, ওয়েলেসলি স্কয়ার বাজুতে রেখে, রাস্তাটা পার হয়ে, একটি গলিতে ঢুকে পড়ে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট পেছনে ফেলে, একপাশে নিউ মার্কেট ও অন্যপাশে দে'জ মেডিকেল স্টোর ও গ্লোব সিনেমার মাঝখান দিয়ে, লিন্ডসে স্ট্রিট পেরিয়ে, চৌরঙ্গীকে যান চলাচলের জন্য একটু সময় দিয়ে, সেই রাস্তাটা উজিয়ে, গড়ের মাঠ বা কেল্লার ময়দানে পৌঁছে যেতেন। তখন মোহামেডান স্পোর্টিং হকি লীগে সেকেন্ড ডিভিশনে খেলছে। সেকেন্ড ডিভিশনের খেলা খোলা মাঠে হয়। টিকেট লাগে না। গোলকিপার ছিলেন শিরাজী। কী দারুণ দেখতে। লেফট-আউটে খেলতেন আব্বাস মীর্জা। তাঁদেরকে কামর ফুটবলও সেই একই পজিশনে খেলতে দেখেছেন।

একদিন সেই খেলা দেখতে গিয়ে অন্য দৃশ্য দেখলেন। রেড রোড দিয়ে স্যার জন অ্যান্ড রসন যাচ্ছেন। সামনে আর পেছনে ঘোড়সওয়ার। ব্রুহার্মে করে লাট সাহেব যাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে ঝুঁকে সবাইকে হাত নাড়িয়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। কামরের মনে হয়েছিল লাট সাহেব হতে হলে, ঐ টপ হ্যাট আর টেইল কোট পরা লোকটির মতো দেখতে হওয়া চাই। নইলে মানায় না। পরে অবশ্য শুনেছিলেন, স্যার জন অ্যান্ডারসন খুব অত্যাচারী লাট ছিলেন। সেদিন অবশ্য একটুও সেরকম লাগে নি। আর একটি ছবির কথা প্রায়ই মনে পড়ে। যে বছর জর্জ দ্য ফিফথের সিলভার জুবিলী হয় সে বছর খুব সুন্দর একটি ছবি প্রচার করা হয়। লম্বা আর্ট পেপারে রাজবংশের ছবি। মাঝখানে বড় করে রাজা-রানীর ছবি। আর গোল করে: প্রিন্স অফ ওয়েলস, ডিউক অফ ইয়র্ক, ডিউক অফ গ্লুস্টার, ডিউক অফ কেন্ট, প্রিন্সেস রয়াল, প্রিন্সেস এলিজাবেথ, প্রিন্সেস মার্গারেট। এলিজাবেথ ও মার্গারেট তখন বালিকা ছিলেন। মার্গারেটকে গোলাপ ফুলের মতো মনে

হয়েছিল। ছবিটা বের করেছিল কারা? স্টেটসম্যান পত্রিকা? কিংবা দি গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল?

কিন্তু গার্ডনারস লেনে তাঁকে একটু দাঁড়াতে হতো। গার্ডনারস লেন আর ইউরোপিয়ান অ্যাসইলাম লেনে অনেক ফিরিঙ্গি বাস করতো। সার্জেন্ট পদটা এদের ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তবু ওরা অনেকেই বেশ গরিব। কী খেয়েছো জিগ্যেস করলে বলতো, ব্রিঞ্জল কাটলেট, রাইস, অ্যান্ড 'ডল' স্যুপ। মানে ডাল-ভাত আর বেগুন ভাজা। কিন্তু তাদের চালচলনের ঠাঁটবাট ছিল রাজবংশীয়দের মতো। তবু, লোকগুলো বেশ ভালো ছিল।

যাই হোক, গড়ের মাঠে যাওয়ার পথে, কামরকে গার্ডনারস লেনে একবার দাঁড়াতেই হতো। ডানদিকে তালতলার পীর সাহেব থাকেন। এবং বামদিকে পরবর্তীকালের সাপ্তাহিক মোহাম্মদী অফিস। এর মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হতো। তখন ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে পীর সাহেবের বাড়ির রাস্তার দিকে জালি দেয়া দোতলার বারান্দার দিকে তাকাতেন। ঐ বারান্দাটার ডানদিকের ঘরটিতে পীর সাহেব বসতেন। লাল, নীল, সাদা পাথর দিয়ে তৈরি মেঝে। ছোট ছোট কুচি-কুচি ভাঙা কাচের মতো করে বসানো। কোনো পাপচিন্তা মাথায় এলেই কামরের বুক ভয়ে ঢিপঢিপ করতো। রাস্তাটা একটু আগেই ডানদিকে ঘুরে আবার বামদিকে মোড় নিয়েছে। সেখানে সারি সারি বিস্কুটের দোকান। এ্যারারুটের বিস্কুট, জিঞ্জার বিস্কুট, লম্বা লম্বা খাঁচ কাটা কাটা নোনতা বিস্কুট, তিল দেয়া গোল গোল নিমকি বিস্কুট। যা বানাতো, বিলিতি বিস্কুটেও অতো স্বাদ থাকতো না। মুসলমানরাই কলকতায় বিস্কুটের চল শুরু করেছে। তখনও তারা তাদের হাত যশ দেখিয়ে যাচ্ছে। বাঁয়া আর তবলা হয় না? সেই বাঁয়ার মতো দেখতে– অবশ্য আকারে খুবই ক্ষুদ্র– লাড়ুয়া বানাতো। মুখে দিলেই মুড়মুড় করে ভেঙে যায়। ব্রিটিশের শাসনামল। তাই অবশ্যই সেই সময়টার খুবই নিন্দে করতে হবে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ছিল খুব ভালো। আর নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল। খাবারে ভেজাল দিলে হাত কেটে নেবে, সেরকম কোনো আইন ছিল না। যে আইন ছিল তা-ই ছিল যথেষ্ট। আর আইন-কানুনের এতো জোর ছিল যে, ভেজাল দেয়ার চিন্তাটা মাথায় এলেই, তারা ভয় পেতো যে, এবার কল্লাটা যাবে। আইন-কানুন হচ্ছে আইন কানুনই। মাজাকির জিনিস নয় সেটা সকলে বুঝতো। সেই লাড়ুয়া বিস্কুটই ছিল কামরের ফেভারিট। খেলা দেখতে যাওয়ার সময় নাকে বিস্কুটের গন্ধ নেয়ার জন্য, দোকানগুলোর সামনে একবার দাঁড়াতেই হতো।

বেগম বুবুদের বাড়ির একতলায় থাকতো কাঞ্চনরা। একতলা থেকে আবার চার ফুট নিচুতে, ভেতরের দিকে, সিঁড়িগুলো আবার একটা পাকা উঠোনে নেবে গেছে। সেই উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটি চৌবাচ্চা না থাকলে, সেই উঠোনটি তার পকেটে, বাচ্চাঁদের একটা ফুটবল মাঠ, সহজেই পুরে ফেলতে পারতো।

সেজন্য ফুটবল খেলা বন্ধ থাকে নি। খেলাধুলোর উৎসবগুলো বাইরের চাতালেই দিব্যি আসর জমাতো। অবশ্য এই চাতালেও অনেকগুলো চৌবাচ্চা ছিল; কিন্তু সেগুলো ছিল একদিকে দেয়াল ঘেঁসে। এই চৌবাচ্চাগুলোর ওপর দিকটা খোলা না রেখে বাড়ির ছাতের মতো চুন-সুরকি-সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সারি সারি কল লাগানো। অনেকেই একসঙ্গে ধোয়ামোছা, গোসল করা সারতে পারে। বাড়ির কাজের বিটিরা এবং আউট হাউসগুলোতে যেসব অফিসের পিওন– যারা বংশপরম্পরায় এই জমিদার বংশের আশ্রিত– বাস করতো, সক্কালবেলা দেখা যেতো, তারা সকলেই কলতলায় বসেছে। পুরুষেরা অফিস যাবে, গা ধুচ্ছে। মেয়েরা বাসন-কোসন ঘসামাজা আর কাপড় ধোয়া নিয়ে আছে। আরো কিছু-কিছু জিনিস নিয়েও ব্যস্ত থাকতো। তাই প্রায়ই নানারকমের গোল বাধতো।

কিন্তু এবার আমরা আবার অন্দরে ফিরে আসবো। সেখানেই আমাদের প্রয়োজন বেশি।

ভেতরে একতলার নিচের পাকা উঠোনে বামদিকে সারি সারি তিনটি কামরা। সেখানে আলো-বাতাস আসে। এককালে তোশাখানা ছিল। এখন ভদ্র পরিবারদের বাসস্থান। উল্টোদিকে রান্নাঘর। মাঝখানে সেই চৌবাচ্চা। এককোণে ছাতে উঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশে একদিকে মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা।

একতলার নিচের এই অংশটাতেই কামররা থাকে। এককালের সেই তোশাখানায়। কামরের আব্বা গনি সাহেব সাব-রেজিস্ট্রার। বদলির চাকরি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও বদলি করা যায় না বলে তাদের কলকাতাতেই রেখেছেন। সাব-রেজিস্ট্রার খুব উচ্চপদ নয়; কিন্তু 'আসলের' চাইতে 'উপরি' অনেক বেশি। কিন্তু তিনটি কারণে গনি সাহেবের সংসারের অবস্থা ভালো নয়। 'উপরি' তিনি নেবেন না। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের সাধ্যের অতীত সাহায্য করবেন। এবং ফুল পে, হাপ-পে, উইদাউথ-পে ছুটি নিয়ে কলকাতায় বসে থাকবেন। এতোসবের পর সংসারে সচ্ছলতা থাকতে পারে না। কামররা তিন ভাই। সে-ই কনিষ্ঠ। অন্য দু'জনের একজন নাইনে আছেন। একেবারে জ্যেষ্ঠ কলেজে পড়েন। কলেজের মাইনে, টিফিন, টেক্সট-বুক, উপযুক্ত সাজ-পোশাক– এসবের খরচ আছে। সবচাইতে ছোটটি বোন। নাম সেহলি। একমাত্র মেয়ে। সখ করে তাকে সাজানো হয়। মাঝখান থেকে সব হিসেব থেকে বাদ পড়ে যায় কামর। তারও যে আর দশজনের মতো কিছু কিছু প্রয়োজন আছে, অবস্থা দেখে সেকথা বলতে সে সাহসই পায় না। কারও জিগ্যেস করার গরজ আছে তাও মনে হয় না। ভাইদের ব্যবহৃত যেসব জামাকাপড় পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই-ই কামরের গায়ে চড়ানো হতো। চড়তে কি চায়। তবু তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ার মতো করে কামর সেই পোশাকই মাথা দিয়ে গলিয়ে দেয়। স্কুলের ছেলেরা ভাবে, ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র তো। তাই সাজ-পোশাক সম্পর্কে উদাসীন। বাড়িতে সেরকম তার কোনো

খ্যাতির প্রয়োজন নেই। তাই কামর ঠিক করে, ওরকম জামা পরার চাইতে খালি গা ভালো। তবু যদি শরীরটা একটু ভরভরাট থাকতো! প্যাকাটির মতো দেখতে। বুকের পাঁজরগুলো খ্যাংরাকাঠির মতো। কারো চোখে পড়তো না। শুধু একজন ছাড়া। সে কাঞ্চন।

সেইদিনের ঘটনাটি কি বালক কামর কোনোদিন ভুলবে? সেই বালকটি এই বয়সেও কামর সাহেবের বুকে বাস করছে।

বিকেলবেলা। সতরঞ্জির ওপর দস্তরখান পাতা হয়েছে। সাজানো আছে নাশতা। গওস সাহেব ডেকে পাঠালেন। গওস সাহেব খুব দাপের লোক। পুলিশের একজন কর্তাব্যক্তি। দুঁদে অফিসার হিসেবে নাম আছে। ইউনিফর্মে দারুণ দেখায়। বাড়িতেও তিনি রণপায়ে চলেন। তাঁর স্ত্রী, একাঘরের গিন্নি, জাহেদা বেগম, বেলুড়ে তাঁর বোনপোর বাড়ি বেড়াতে গেছেন। যাবেন বলেই, আজকের নাশতার আয়োজনে বাড়াবাড়ি আছে। বাইরে গওস সাহেব ব্যাঘ্রপ্রায়। কিন্তু বাড়িতে তিনি বেগম সাহেবার খুরে খুরে চলেন। তাঁর মেজাজটি হচ্ছে, বাইরে খরায় পোড়া, আর অন্দরে জলায় ভাসা। অবশ্য, তার এই অবস্থাটি একমাত্র স্ত্রী সমীপে। কিন্তু তাঁর আরাম-বিরামের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন জাহেদা বিবি।

কাঞ্চনরা এক ভাই, দু'বোন। ভাই বশীর বড়। খুকী সবচাইতে ছোট।

বড় ভাই বশীর খুব মজার লোক। ক্লাস নাইনে পড়ে।

একদিন কী একটা কথা জানতে চেয়েছিল কামর।

জবাবে বশীর বললো : ঘর ঘটাক্কা ঘচাং।

'কথাটার মানে কী হলো, বশীর ভাই?'

'আওয়াজ শুনে যদি মানে না বুঝে থাকো, তাহলে আর বুঝবে না!'

আর একদিন বশীর ভাই খেলা দেখতে যাচ্ছেন। একেবারে সদর দরোজার মুখে কামরের সঙ্গে দেখা।

'বশীর ভাই কোথাও যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, একটু ধড়পড় ধুককি করে আসি।'

'ধড়পড় ধুককির মানে কী ?'

'মানে আমিও ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হলো ঐরকম একটা আওয়াজ বের করতে পারলে আমি যা বলতে চাই তা ঠিক প্রকাশ হবে। বলতে বলতে একদিন মানে দাঁড়িয়ে যাবে।'

সেই সংসারে বাস করে আর একটি মেয়ে। তার নাম খাতুন। গওস সাহেবের বড় ভাইয়ের মেয়ে। বড় ভাইয়ের অবস্থা ভালো নয়। দেশের বাড়িতেই থাকেন। খাতুনকে মানুষ করার ভার নিয়েছেন গওস সাহেব। সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে ক্লাস সেভেনে পড়ে। বয়সের তুলনায় নিচুতে পড়ে। মেয়েটি

কালো, ছিপছিপে, কিন্তু দেখতে ভালো। স্কুলে ইউনিফর্ম পরে যেতে হয়। কিন্তু বাড়িতে শাড়ি। সে খুব কড়া কড়া বাংলা বলে। যেমন, অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে; অনেক গবাকালে গোবর্ধন বাবু হয়; অবলার মুখই বল; অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। একদিন বশীর ভাইয়ের সঙ্গে মানে নিয়ে তার তর্ক লেগেছিল। বশীর ভাই 'আলালের ঘরের দুলাল' বইটি পড়েছেন। খাতুন এসে বললো, 'বলো দেখি, 'আলালের ঘরের দুলাল' মানে কী?' বশীর ভাই কী একটা বললেন। খাতুন জবাব দিলো, "জি না। আপনি কিছুই জানেন না। 'আলালের ঘরের দুলাল' মানে হচ্ছে 'আদুরে বাপ-মার বখা ছেলে। যেমন আপনি।' খাতুন বশীর ভাইকে 'তুমিই' বলে। শুধু বিদ্রুপ করার ইচ্ছে হলে 'আপনি'-তে উন্নতি দেয়। বাড়িতে সবার সঙ্গেই যে তার হাসি-তামাসা-বিদ্রুপের সম্পর্ক তা নয়! কাঞ্চন কোনো রূঢ়তা প্রকাশ করে না। বেশি মাখামাখিও করে না। জাহেদা বিবি তাঁর দূরত্বটা রাখেন; কিন্তু খাতুনকে ঠিক অসহ্য মনে হয় না। মুখ থেকে কথাটা খসার আগেই সে জাহেদা বিবির ইচ্ছেটা পূর্ণ করে। সে জানে সে পরাশ্রিতা। এই সংসারের খুঁটিটা কার শক্ত হাতে ধরা আছে সেটা বোঝার মতো ধূর্ততাও আছে তার। আর সে এ-কথাও জানে, কমলার কৃপা চাই তার। বশীর ভাই জিগ্যেস করেন, অতো বাংলা শিখলে কোথায়?

'গ্রামের লোকের মুখে-মুখে ওসব কথা ঝরছে।'

'তাই বলো। বিলকুলুট্টি গ্রামাইয়া।'

'সে আবার কী?'

'মানে বুঝবে অতোটা ভালো বাংলা তুমি এখনো শেখো নি।'

শুধু বশীর ভাইয়ের কাছেই সে প্রশ্রয় পায়। একটু বেশিই পায়।

খাতুন যে খুব হাসিখুশি স্বভাবের তা মোটেও নয়। সে খুবই খল। এবং সব খলদের মতো দুর্দান্ত চালাক। এবং অভিনয়ে অবিশ্বাস্যরকম পটু। বশীর ভাই ও সে প্রায় সমবয়সী। এই হয়তো বশীর ভাইয়ের সঙ্গে মশকরা করে এলো। দরোজা থেকে বেরুলেই দেখবে সামনের হলটিতে বসে গওস সাহেব হুঁকো টানছেন। দরোজা থেকে বেরুবার আগেই সে মুখ থেকে হাসির সব কটি রেখা মুছে ফেলতে পারে। মাথাটা সোজা রাখে। মুখে টেনে আনে, অটল গাম্ভীর্য। দরোজা পেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখশ্রী আদব-তমিজে ভরপুর। পদক্ষেপ মন্থর-অচঞ্চল।

একদিন দুপুরে সে মেঝেতে শুয়ে আছে। তার দুটি পা থামের মতো বেরিয়ে আছে। শাড়ি উঠে পড়েছে হাঁটুরও ওপর। বশীর ভাই তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দৃশ্যটি চোখে পড়লো তাঁর। দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু তাঁর তাড়া আছে। কামর দেখেছে কিন্তু ভালো বোঝে নি। বশীর ভাই, খুব দ্রুত হাঁটছেন।

'কোথায় যাবেন?'

'বুকের ভেতর ধাই কড়াকড় বাদ্যি বাজছে কিনা। তাই ছুটছি।'

বাইরের যে বিরাট চত্বরটি ছিল, তার এক কোণে, চৌবাচ্চাটির বাজুতে, একটি কামরাও ছিল। ছাদটি চাপা, কিন্তু কামরাটি বড়। পাশাপাশি চার-পাঁচটি তক্তপোশ, এক-একটিতে এক-একজন থাকে, আর ছোট ছোট জানালা দিয়ে বাইরে কী সব দেখতে থাকে। তারা সকলেই পিওন, আরদালি ! কিন্তু গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট বলে তাদের খুব ডাঁট ছিল। প্রায়ই তারা রাত নটার শোতে সিনেমা দেখে। ফুটবল লীগের সময় গড়ের মাঠে যায়। আর কামরকে খুব অবজ্ঞার সঙ্গে সেসব গল্প বলে। তবু তাদের মধ্যেই কামর স্বস্তি পেতেন। সেখানেই গিয়ে বসতেন।

একদিন সন্ধ্যায় তারা আগের দিন রাত্রের একটি ঘটনার কথা বললো। বশীর অনেক রাত করে ফিরেছে। এতো মদ খেয়েছে যে, পা টলছে। কিন্তু বাপ তাকে ঐ অবস্থায় দেখলে আচ্ছা করে ধোলাই-পেটাই করবে সে হুঁশটা আছে। এসেই জিগ্যেস করে, গওস সাহেব কোথায়? বাপের নাম ধরেই জিগ্যেস করে। কী হয়েছে কেউ জানে না; কিন্তু জামাকাপড় ছেঁড়া। একজন আরদালি ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলো, এমন হলো কী করে? বশীর বললো, এলো-এলো এলোরে। তেড়ে মেরে ধাইয়া। মাথার কাছে ফেটে গেছে। একজন সাফসুতরা করে দিচ্ছে। বশীর বলে, লাগছে। অমন হড়বড়ন্তি ফ্লাই করো না।

আর কামর তো নিজের কানেই শুনেছে, খাতুনকে জিগ্যেস করেছেন, কালী-কা ঠ্যাঙ্গের ঠ্যাঙানি খাবে?

'কী বলছো?'

'বুঝবে না। তুমি এখনো 'নুটু যদি টুনু হয়' স্টেজে আছো। অমন বইটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।'

বেগম বুবুর প্রথম বাচ্চাটি সবে তিন মাসের। বশীর তাকে খুব দোল খাওয়াচ্ছে আর বলছে, 'ডিগিডিগি ডাম্পো। সোনামুখী চোম্পো।'

বুবুও হাসতে হাসতে বলেন, 'কী মানে হলো?'

বশীর হাসতে হাসতে বলে, বুবু, আপনিও বুঝলেন না? এই বাড়িতে মানুষ বলতে একা আপনিই তো আছেন। আমার কী মনে হয় জানেন? ডিগিডিগি ডাম্পো সোনামুখী চোম্পো বললে, আমার বুকের সমস্ত ভালোবাসা বাচ্চাটিকে জানিয়ে দেয়া হয়। দেখছেন না, আমার দিকে তাকিয়ে কেমন হাসছে? বাচ্চারা ফেরেশতা হয় তো। তাই আর একজন ফেরেশতা দেখলে ঠিক চিনতে পারে।'

'পাগল ছেলে!'

কামরের মনে হয়, বশীরের সঙ্গে তওফিক ভাইয়ের খুব মিল আছে। অবশ্য সব দিক দিয়ে নয়। দু'জনেই খুব ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র। এবং তাঁরা সমবয়সী। সি কে

নাইডু ভালো ক্যাপ্টেন কিংবা সৈয়দ ওয়াজির আলী– দু'জনের এই নিয়ে তর্কও হয়।

বশীরের কথা আজ খুব মনে পড়ছে কামর সাহেবের।

বেগম বুবুর বাচ্চা হয়েছে। খুব ধুম করে মিলাদ হলো। বাদ মাগরেব মিলাদ। বিখ্যাত বাবুর্চি এনে বিরিয়ানি রান্না হয়েছিল। অনেক রাত। সবাই চলে গেছে। বেগম বুবুকে একা পেয়ে বশীর জিগ্যেস করলো, 'আচ্ছা বুবু, মওলবী সাহেব কয়েকবার বললেন, মনে মনে দরুদ শরিফ পড়ুন। দরুদ শরিফ কী?'

বেগম বুবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'তুমি যে তাজ্জব বানালে। তোমার আব্বা-আম্মা এতো নামাজ-রোজা-মিলাদ করেন। আর তুমি দরুদ শরিফ জানো না। তুমি যে দোজখে যাবে। দরুদ শরিফ কি একটি?'

'আমি কি আর ওসব জিনিসে থাকি নাকি?' এই বলে বশীর সটাং শুয়ে পড়ে বেগম বুবুর পায়ের ওপর মুখটা পেতে দিলো।

'আপনি একটু দোয়া করুন। আমি দোজখে যাবো না। তাছাড়া আমি অতো সহজে মরছি না।' এই বলে সে আবার উঠে পড়লো।

'মিলাদে যাও না। এখানে এলে যে? বিরিয়ানির লোভে?'

'তা বলতে পারেন। তাছাড়া, আপনি ডেকেছেন। না এলে মনটাই খারাপ হয়ে থাকতো।'

না, হাসি-তামাশার কথা নয়। ছেলেটার জন্য চিন্তা হয়। বেগম বুবু অনেক দোয়া-দরুদ পড়ে বশীরের মাথায় ফুঁ দিলেন। বশীর এসবে বিশ্বাস করে না। কিন্তু মাথা পেতে বুবুর দোয়া গ্রহণ করলো। আজ কামর সাহেবের মনে হয়, তওফিক ভাই বশীরের অবস্থায় থাকলে বশীরের মতোই হতেন। আর বশীর যদি তওফিক ভাইয়ের অবস্থায় থাকতো, একেবারে তওফিক ভাই হয়ে যেতো।

কিন্তু এতো করে এইসব চিন্তা কামর সাহেবের মাথায় আসছে, তার কারণ, আসল ঘটনাটি তাঁর স্মৃতি স্পর্শ করতে চাইছে না। সে ঘটনাটির কথা ভাবলে এখনো মন বিস্বাদ হয়ে যায়।

কিন্তু কামরের মন সেই দুর্বল জায়গায় বসে, বারবার উড়ে উড়ে ফিরে এলেও, এইবার সেই কাজটি সেরে ফেলতে হবে। শুরু এইভাবে।

একদিন দুপুরে বশীরকে খেতে ডেকেছেন বেগম বুবু। সঙ্গে সঙ্গে কামরও উঠে এসেছে। বেগম বুবু একবার চোখ তুলে কামরকে দেখলেন। তার চোখের দৃষ্টি দেখেই মনে হলো, কামর তাকে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে। কামরকে ডেকেও দস্তরখানের সামনে বসিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু বশীর এক স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল, হাসিখুশি, সুসজ্জিত ছেলে। তার পাশে কামরকে বসালে দৃশ্যটি দৃষ্টিকটু হয়। খাওয়া-কথা কিছুই জমবে না। কামর পরে আছে একটা মলিন খাকি হাফ প্যান্ট।

গায়ে কিছুই নেই– একটুখানি মেদও নেই। প্রায় একটি কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে তাকে। বশীরও একটা কিছু বলবে বলে মুখ তুলে, কথাটি না বলেই, খেতে বসে পড়লো। কামর সরে এলো বারান্দায়। কামরের সেই অল্প বয়সেও মনে হয়েছিল, বেগম বুবু তাকে কিছু কম ভালোবাসেন, তা নয়, কিন্তু ভালোবাসাকে বাধা দিতে পারে এমন জিনিসও সংসারে আছে।

খাওয়া শেষ করেছে বশীর। ওগলদানিতে হাত ধুতে ধুতে বললো, এতো খেয়েছি, এখন একটু দমসম লাগছে।

বেগম বুবু জানতে চাইলেন, 'দমসম' কী জিনিস?

'জানো না বুঝি? তোমরা যাকে আঁকুপাঁকু করা বলো।'

'তাহলে আঁকুপাঁকু না বলে দমদম ব্যারাকপুর বলছো কেন?'

বশীর হাসলো।

'বলছি কেন? খাতুন মেয়েটি আছে না? আর কিছুই করতে হবে না? তুমি শুধু একবার তার পাশে গিয়ে দু'ঘণ্টা বসো, দেখবে ম্যাট্রিকে বাংলায় 'লেটার' পেয়ে গেছে। সেদিন আমি কী একটা রসিকতা করেছি। বুঝতে পারছিলাম খাতুনের খুব হাসি পেয়েছে; কিন্তু এমন ধড়িবাজ মেয়ে। একফোঁটাও হাসলো না! বললো, 'চাষার গদ্দি কাস্তের ঠোকর'। আজ পর্যন্ত মানে বুঝলাম না। গাল দিলো কিনা তাও জানি না। আর এক সন্ধ্যার কথা শুনুন। দেখি কি ইলেকট্রিক বাতি না জ্বালিয়ে, একটা হারিকেনের সামনে গোঁজ হয়ে বসে আছে। সক্কালবেলা আমরা সকলেই আম্মার গলার আওয়াজ 'চওথা আসমানে' চড়তে শুনেছি। খাতুন কিছু একটা করেছে। আম্মা বেরহম হয়ে ধোলাই দিচ্ছেন। তারপর সারাটা দিন গেছে। খাতুন রোজ যেভাবে চলাফেরা খাওয়া দাওয়া করে, কথা বলে সেইভাবেই দিন কেটেছে। কিন্তু খাতুন যে সকালের মন খারাপ হওয়াকে সন্ধ্যার জন্য তুলে রেখেছে তা তো জানি না। জিগ্যেস করলাম, ওভাবে আঁধারে বসে আছো কেন? ও যে জবাবটা দিলো, সেটা তার দুঃখ প্রকাশের জন্য, না আমাকে কিছু বাংলা ভাষায় জ্ঞানদানের জন্য তা বলতে পারবো না। বললো– ওর গলার আওয়াজ দুঃখে নদীর মতো ছলাত-ছলাত করছে– 'আজ চাচিআম্মার 'গণ্ডায় এন্ডা' দিতে কমতি হয়েছে। তিনি যা মুখে এসেছে বলেছেন।

বুঝলাম বাইরে থেকে যতোই স্বাভাবিক দেখাক, আম্মার সঙ্গে সকালবেলার আড়াআড়ি সম্পর্কটা থেকেই গেছে। খাতুনের জন্য দুঃখ হতে পারতো। কিন্তু 'গণ্ডায় এন্ডা' শব্দ দুটির আওয়াজেই এমন একটা মজা আছে– থাকে না আওয়াজের মধ্যে কতোরকম মানে?– যে আমি হাসিটাকে কিছুতেই তাড়াতে পারলাম না। আমাদের আশ্রয়ে আছে। তাই বললাম, আছে! বড় হয়ে আমি তোমার সব দুঃখ দূর করে দেবো। বেগম বুবু, ও বলে কী শুনবেন? বললো, তুমি যে কতো বড় হবে, তা জানাই আছে। 'উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।' বাপের

জন্মে ওরকম ভাষা শুনি নি। আরো বললো, অবশ্য 'অনেক গবাই কালে গোবর্ধন বাবু' হয়। কিন্তু হলেও তুমি আমার দুঃখ দূর করবে না আমাকেই দূর করে দেবে, তা দেখা যাবে খন।'

'তোমাদের আশ্রিত বলেই খাতুনের জন্য তোমার খুব মায়া। তাই না?' বেগম বুবুর চোখ একবার হাসিতে নেচে উঠেছিল কিনা, কামর অতোটা দেখে নি। কিন্তু খাতুনকে তিনি পছন্দ করেন না। খাতুনের প্রসঙ্গ তিনি বদলে দিলেন।

'তোমাকে আমি হুজুরের কাছে নিয়ে যাবো।'

'কোন্ হুজুর?'

'বলতে জিভে বাধলো না। আমাদের হুজুর কে?'

'নিয়ে যাবে কেন?'

বেগম বুবু বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে এতো জেহেন দিয়েছেন। তুমি যদি উচা হওসলা রাখো, জীবনে অনেক তরক্কি করবে। কিন্তু এই বয়সেই এতো রাত করে বাড়ি ফেরো কেন? তুমি বলতে গেলে লেখাপড়া ছেড়েই দিয়েছে। এসব দেখতে ভালো লাগে?'

'দ্যাখো, বেগম বুবু, আমি অতো ধর্মটর্ম মানি না। তবু হুজুরকে আমার মুখ দেখাতে পারবো না। তাঁর সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় আমি খাক হয়ে যাবো। এতো গোনাহ করেছি।'

'না, খাক হবে না। দেখবে মনে নতুন বল এসেছে। মনে হবে সব মুশকিল আসান হয়ে গেছে।'

'না বুবু। আমি পারবো না। সারা দুনিয়া উল্টোটা করতে বললেও আমি যা করবার তাই করবো। কিন্তু হুজুর যদি বলেন 'ভাই জরাসা পড়হিয়ে' তাহলে বই নিয়ে আমাকে বসতেই হবে। হুজুরের জযবার সামনে আমার মতো লোকের মনও ঝুঁকে পড়ে।'

বেগম বুবুর বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। তাঁকে জিগ্যেস করলে তিনি কোনো কারণ দেখাতে পারতেন না। বশীর তাঁকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিলো না। জোর পা চালিয়ে নিচে নেবে গেল।

কামর বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। বেগম বুবু ধীর পায়ে এসে তার হাত ধরলেন।

'চলো, খাবে চলো।'

কামর নম্রভাবে হাত ছাড়িয়ে নিলো। খেতে বসলো না। সেও নিচে নেবে গেল। তার পায়ে পায়ে দুঃখ বাজছে।

সেইদিকে তাকিয়ে থাকলেন বেগম বুবু।

মনে মনে বললেন, 'হাঁ কামর। আমি কসুর করেছি।'